ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

সমকালীন শ্রেষ্ঠ বিদেশি গল্প

সংকলন ও অনুবাদ
উৎপল দাশগুপ্ত

KOBI PROKASHANI

সমকালীন শ্রেষ্ঠ বিদেশি গল্প
সংকলন ও অনুবাদ : উৎপল দাশগুপ্ত

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০২৫

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
অনুবাদক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য : ৪৫০ টাকা

Samakalin Shreshtho Bideshi Golpa by compiled & translated by Utpal Dasgupta
Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: April 2025
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 450 Taka RS: 450 US 25 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-99903-9-0

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

আমার মা প্রয়াতা হিমানী দাশগুপ্ত-এর স্মৃতিতে

ভূমিকা

খুবই কাকতালীয়ভাবে আজ মাতৃভাষা দিবস, আর আজকেই আমি উৎপল দাশগুপ্তর অনুবাদ করা *সমকালীন শ্রেষ্ঠ বিদেশি গল্প* নামের এই অনুবাদ সংকলন নিয়ে দু'কথা লিখতে বসেছি। সংবাদ মাধ্যম, সোশ্যাল-মিডিয়া এবং বিভিন্ন সভা, অনুষ্ঠানে আজকের দিনের স্মৃতিচারণ, শুভেচ্ছা-বিনিময়, অভিনন্দন এবং ১৯৫২ সালের ভাষা-শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন যেমন চোখে পড়ছে, তেমনই বাংলা ভাষার ওপর ইংরেজি, হিন্দি আবার কোথাও আরবি, ফারসির আগ্রাসনের কথা তুলে ধরা হচ্ছে। এই নিয়ে কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা কম হয় না। আবার যে কে সেই। ধর্ম সম্পর্কে যে কথাটি প্রযোজ্য যে নিজের ধর্ম স্বচ্ছন্দে পালন করো, পাশাপাশি অন্য ধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধা রেখো। ভাষা সম্পর্কেও এটাই বলা যায়, নিজের ভাষাকে এগিয়ে নিয়ে চলো আর অন্য ভাষার প্রতিও শ্রদ্ধা বজায় থাক। তা না হলে যে 'কূপমণ্ডূক' বিশেষণটি গায়ে এসে পড়বে। অন্য ভাষা, সংস্কৃতি থেকে না নিলে নিজেদের ভাষাকে উন্নত করা তো অসম্ভব। যুগে যুগে এই ধারা চলে আসছে। কোথাও যেন পড়েছি অন্য ভাষা থেকে অনুবাদ করার 'অভ্যেস' করলে নিজের ভাষায় যে রচনা, তা সমৃদ্ধ হয়, ঋদ্ধ হয়। মানেটা খুব সোজা, নিজের ভাষাকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করতে হলে অন্য ভাষা থেকেও আহরণ করতে হবে। ছোটবেলা থেকেই তো বাংলা ছড়া, গল্পের পাশাপাশি একই রকম ভালোবাসায় পড়ে ফেলতাম রুশ-উপকথার বাংলা অনুবাদ।

সমকালীন শ্রেষ্ঠ বিদেশি গল্পর প্রথম গল্পটিকে দেশি গল্পও বলা চলে, গল্পটির নাম 'এক রুমাল, এক অঙ্গুঠী অওর এক ছলনী'। অমৃতা প্রীতম লিখতেন নিজের মাতৃভাষা পাঞ্জাবি ভাষায়। গল্পটি মেয়েদের নিয়ে লেখা কিন্তু নারীবাদী লেখা বলতে যা বোঝায় তা একেবারেই নয়। বরং সেই মেয়েদের উৎসর্গ করে লেখা যারা সারাটা জীবন নিজের আবেগ, নিজের ইচ্ছেকে চেপে নিজের সাথেই ফুরিয়ে যেতে দেয়। শাশুড়ি 'রুপো' আর বউমা 'বনতী' এদের সম্পর্ক যাই হোক তারা ছিলেন দুই সখি। কৈশোরের ভালোবাসাকে তারা মুছে, মাটিচাপা দিয়েও আজীবন লালন করে চলেছে। এই সংকলনে বেশ কিছু নোবেল পুরস্কার, বুকার পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিকের ছোটগল্পের অনুবাদ আছে। যেমন আবদুলরজাক গুরনাহ্। এঁর মাতৃভাষা সোয়াহিলি, তবে কৈশোরে যুক্তরাজ্যে শরণার্থী হয়ে যাওয়া এই সাহিত্যিক ইংরেজি ভাষাতেই লেখালেখি করেন। এঁর ছোটগল্পটির নাম অনুবাদক রেখেছেন 'খাঁচা'

(Cages)। গল্পের মূল চরিত্র হামিদ সারা দিন বসে থাকে এক দোকানে। আর তার দোকানে জিনিস কিনতে আসা রুকিয়াকে নিয়ে মনে মনে কল্পনার দেশে পাড়ি দেয়। যদিও দোকানের ইট, কাঠ, লোহা দেয়াল যেন এক খাঁচার মধ্যে তাকে বদ্ধ করে রেখেছে। গল্পটির শেষে চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন শুভদীপ বড়ুয়া। লিডিয়া ডেভিসের একসাথে দুটি অনুগল্পের একটির নাম 'গুটিপোকা'। ছোট্ট এক গুটিপোকা যেটা দেখতে দেখতেই হারিয়ে গেল। তারপর তাকে খোঁজাখুঁজির আর শেষ নেই, নিজের আকৃতির মতো গুটি মেরে সে লেখকের মনে বেশ কিছু দিন বসে থাকে।

হারুকি মুরাকামির বেশ কিছু গল্প অনুবাদ রয়েছে এই বইয়ে। এপ্রিলের এক মনোরম সকালে এক যুবক রাস্তায় যেতে দেখে এক যুবতীকে। যুবকের মনে হয় এই মেয়েটি সবদিক থেকেই নিখুঁত, একশতে একশ ভাগ। যুবকের বুকের ধুকপুকুনি বেড়ে যায়, শুকিয়ে যায় মুখ। তারপরই শুরু মেয়েটিকে নিয়ে তার ফ্যানটাসাইজ করা। নিয়তি তো সবসময়ই নিষ্ঠুর। ১০০ ভাগ নিখুঁত মানুষের প্রেমও কি বেশ কিছু বছর পর আবার দেখা হলে ১০০ শতকরা থাকবে? মুরাকামির গল্পের ইংরেজি অনুবাদ On Seeing the 100% Perfect Girl One Beautiful April Morning থেকে বাংলায় ভাষান্তর করা হয়েছে। আজকের অন্যতম জনপ্রিয় সাহিত্যিক হারুকি মুরাকামির লেখা আরও কটি অনবদ্য গল্পের অনুবাদ বইটিতে আছে। সাল্ওয়া বক্র মিসরের লেখিকা। মিসরীয় মেয়েদের জীবনের গল্প তিনি লিখেছেন। 'উত্তরাধিকারিণী' গল্পে বছর চল্লিশের এক স্বামী-পরিত্যক্তা, অসুস্থ ছেলের মা, যিনি জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে কাটান। এই বুঝি তার চাকরি চলে যাবে, মাথায় ছাদ ভেঙে পড়বে এইসব। শেষে তিনি তাঁর এক বৃদ্ধা প্রতিবেশিনীর কাছে যেন জীবনের মানে খুঁজে পান, এমনকি মৃত্যুরও।

ষোলোজন লেখকের মোট বাইশটি ছোটগল্পের অনুবাদ *সমকালীন শ্রেষ্ঠ বিদেশি গল্প* বইটিতে রয়েছে। প্রতিটি গল্পের নিচে আছে লেখক পরিচিতি। অনুবাদ গল্পগুলো বিভিন্ন সময়ে *গল্পপাঠ* ওয়েবজিনে প্রকাশিত হয়েছে। অনলাইন এই সাহিত্য-পত্রিকার কর্ণধারদের মধ্যে অন্যতম শ্রীকুলদা রায় ও শ্রীমতী নাহার তৃণা অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিশ্বসাহিত্যের বিভিন্ন গল্পের ভাষান্তরের কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। অনুবাদকদের মধ্যে উৎপল দাশগুপ্তও বেশ কিছু বছর যাবৎ তাঁদের সাথে যুক্ত। উৎপল দাশগুপ্তের অনুবাদ যেমন মূলানুগ, ভাষা তেমনই স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ও ঝরঝরে।

বিশ্বের নানা দেশের জনপ্রিয় লেখকদের গল্পের অনুবাদ সংকলনটি আশা করি পাঠকের মন ভরাতে সক্ষম হবে।

সুদেষ্ণা দাশগুপ্ত
২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

সূচিপত্র

একটা রুমাল, একটা আংটি, একটা ছাঁকনি • ১১
অমৃতা প্রীতম
খাঁচা • ২২
আব্দুলরজাক গুরনাহ্
২টি গল্প • ৩০
লিডিয়া ডেভিস
আমার স্বভাবের কয়েকটি অপছন্দের দিক • ৩৩
লিডিয়া ডেভিস
এপ্রিলের এক সুন্দর সকালে ১০০% নিখুঁত মেয়েটিকে দেখে • ৩৮
হারুকি মুরাকামি
নির্যাস • ৪৩
হারুকি মুরাকামি
কাহো • ৫৬
হারুকি মুরাকামি
একটি জানালা • ৭০
হারুকি মুরাকামি
কেশের উত্তরাধিকারিণী • ৭৫
সাল্ওয়া বক্র
ঘুমন্ত রাজকুমারী এবং হাওয়াই জাহাজ • ৮২
গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ
চাঁদের দূরত্ব • ৮৮
ইতালো ক্যালভিনো
জাগুয়ার সূর্যের পদতলে • ১০২
ইতালো ক্যালভিনো
ক্রিস্টোফার কলম্বাস এবং স্পেনের রানি ইসাবেলা তাঁদের লিপ্সাতৃপ্তি করলেন • ১২০
সালমান রুশদী
৩টি গল্প • ১২৯
পিটার বিশেল
ধূমপানরত দুজন নার্স • ১৩৩
ডেভিড মিনস

ফ্লোরেন্স গ্রিন ৮১ • ১৪৮
ডোনাল্ড বার্থেলমি
মিছিমিছি • ১৬১
ইন্তিজার হুসেইন
সংসারী মানুষ • ১৬৫
মিখাইল শলোকফ
ভাসমান বস্তুকক্ষে শৃঙ্খলাহীনতা • ১৭২
জর্জ সন্ডার্স
স্কুল শিক্ষিকার অতিথি • ১৭৮
ইসাবেল আয়েন্দে
স্বপ্নের ছবিগুলো • ১৮৫
কেনজাবুরু ওই

একটা রুমাল, একটা আংটি, একটা ছাঁকনি

অমৃতা প্রীতম

বান্টি ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস এইট পর্যন্ত আমাদের সাথেই পড়ত। ওর বয়স যখন পাঁচ, ওর বাবা ওকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য এলেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বান্টির স্কুলের মাইনে মওকুব করে দিলেন আর ওকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে দিলেন না।

সেভেন আর এইটের মেয়েরা একই ঘরে ক্লাস করত, কিন্তু টিফিনের সময় ক্লাস এইটের মেয়েরা ক্লাস সেভেনের মেয়েদের ধারেকাছে ঘেঁষতে দিত না। সবসময় আলাদা হয়ে নিজেদের মধ্যেই জটলা করত। আমরা ক্লাস সেভেনের মেয়েরা যখনই ওদের কাছাকাছি যেতাম ওরা আমাদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দিত। ক্লাস এইটের মেয়েদের ওপর আমাদের খুব রাগ হতো, ভাবতাম আমরা যখন ক্লাস এইটে উঠব, ক্লাস সেভেনের মেয়েদের সঙ্গে কখনোই এমন ব্যবহার করব না।

তারপর আমরাও ক্লাস এইটে উঠলাম। গরমের ছুটির পরে যখন স্কুল খুলল, আমাদেরও সেই একই কাজ করতে হলো—যেটা আমরা কখনোই করব না বলে ঠিক করে রেখেছিলাম। এই তেরো আর চৌদ্দ বছর বয়সটা ঠিক কেমন হয় জানি না! হয়তো এটা হলো শৈশব থেকে কৈশোরে পা দেওয়ার সন্ধিক্ষণ। এই সময় মেয়েরা একটা পা শৈশবে রেখে অন্য পা'টা কৈশোরে বাড়িয়ে দেয়।

সেবার গরমের ছুটির সময় পাড়ারই একটা ছেলের কাছে বান্টি পড়া বুঝে নিচ্ছিল। প্রতিদিন টিফিনের সময় বান্টি লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের কাছে ছেলেটার গল্প করত। ক্লাস সেভেনের মেয়েদের, আমরা ক্লাস এইটের মেয়েরা, এখন আর টিফিনের সময় আমাদের ধারেকাছে ঘেঁষতে দিতাম না।

যেদিন বান্টি ওই ছেলেটার কথা বলত না, আমাদের স্কুলের টিফিনের ছুটির সময় মনে হতো যেন টিফিনের ছুটিটাই হয়নি।

'আমার তো শুধু ওর সঙ্গে হাসতে আর কথা বলতে ভালো লাগে, এ ছাড়া ওর সঙ্গে আমার আর কী থাকতে পারে! মাঝে মাঝে এই কথা বলে বান্টি আমাদের এড়িয়ে যেতে লাগল। যতই আমাদের এড়িয়ে যাক না কেন, বান্টির হাবভাব দেখে মনে হতো ওর সেই হাসা আর কথা বলা ভালো লাগাটা কণ্ঠ পেরিয়ে ওর হৃদয়েও

একটা জায়গা দখল করে ফেলেছে। ফলে প্রায়ই ও আমতা আমতা করতে থাকত আর মুখে কোনো কথাই সরত না।

পাগলিটা একদিন একটা পেন্সিল নিয়ে অঙ্কের খাতার অন্তত কুড়িটা জায়গায় ওই ছেলেটার নাম লিখে ফেলল—'রাজু...রাজু...রাজু...'। আমাদের মাস্টারনি ওর খাতাটা দেখে ফেললেন। ক্লাসে তো ওকে কিছু বললেন না, তবে টিফিনের সময় ওকে নিজের কামরায় ডেকে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। মনে হলো বান্টির কপালে দুঃখ আছে। কিন্তু আমরা তো বান্টির বন্ধু। আমাদের সবারই মন খারাপ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে বান্টি যখন বেরিয়ে এলো তখন কেঁদে কেঁদে ওর চোখ লাল হয়ে গেছে। খাতায় যেখানে যেখানে রাজুর নাম ছিল, মাস্টারনি রাবার দিয়ে সেগুলো সব মুছে দিয়েছেন।

তারপর ক্লাস এইটের বার্ষিক পরীক্ষা যখন একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল, আমরা মেয়েরাও নিজের নিজের মতো আলাদা হয়ে গেলাম। আমাদের স্কুলে ক্লাস এইট পর্যন্তই পড়া যেত। অনেক মেয়েই অন্যান্য স্কুলে ভর্তি হয়ে গেল। বান্টি গেল সেলাইয়ের স্কুলে।

দুবছর বাদে আমি বান্টির বিয়ের কার্ড পেলাম। অন্য মেয়েরাও নিশ্চয়ই পেয়েছিল। আমি তাড়াতাড়ি বিয়ের কার্ডে ছেলেটার নামটা দেখলাম, লেখা ছিল—'কর্মচন্দ'। কার্ডে 'রাজু'র জায়গায় যদিও 'কর্মচন্দ' লেখা ছিল, তবুও ওটা বিয়েরই কার্ড, সন্দেহ নেই, আর যেকোনো বিয়েতেই অভিনন্দন জানাতে হয়। আমিও বান্টিকে অভিনন্দন জানাতে ওর বিয়েতে গেলাম।

বান্টির হাতে মেহেন্দি, বান্টির বাহুতে অলংকার। আমি বান্টিকে অভিনন্দন জানালাম।

বান্টির সঙ্গে ওই হাসি আর কথা বলা প্রেমের ব্যাপারে কোনো কথা তুলতে চাইনি, কিন্তু একটু পরে ও-ই আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল, তারপর বলল—

'আমার একটা জিনিস যত্ন করে রাখতে পারবি?'

'কী জিনিস?'

'একটা রুমাল।'

এই রুমাল কার সেটা জিজ্ঞেস করার দরকারই বোধ করলাম না। রুমালটা রাজুরই হবে।

'এ আর এমন কী ব্যাপার? রুমালটা তুই নিজের জিনিসের সঙ্গেই তো রেখে দিতে পারিস!'

'কিন্তু ওটার এক কোণে ওর নাম লেখা আছে যে।'

'কার নাম, কে আর জানবে?'

যদি শুধু 'রাজ' লেখা থাকত—কেউ দেখলে বা জিজ্ঞেস করলে বলে দিতাম আমার বান্ধবীর নাম, কিন্তু 'রাজু' লেখা আছে যে। রাজু যে মেয়েদের নাম হয় না।'

'কী দিয়ে লেখা?'

'একদিন ও পেন্সিল দিয়ে লিখে দিয়েছিল। আমি ছুঁচ সুতো দিয়ে ওটার ওপর এম্ব্রয়ডারি করে নিয়েছি!'

'তো সুতো তুলে ফেল!'

'তুলে ফেলব? এই কথাটা তো আমার মাথায় আসেনি!' বান্টি লম্বা করে শ্বাস নিল। বলতে লাগল, 'তোর মনে আছে, একদিন আমাদের মাস্টারনি রাবার দিয়ে আমার খাতা থেকে ওর সব নামই মুছে দিয়েছিলেন? আর আজ আমি সেভাবেই ওর নাম তুলে ফেলছি।'

মনটা ভারী হয়ে গেল। আমারই সামনে বান্টি ট্রাঙ্ক খুলে সুখস্মৃতির সেই রেশমের রুমালটা বের করে ছুঁচ দিয়ে এম্ব্রয়ডারি করা রাজুর নামটা তুলে ফেলতে লাগল। বান্টিই ওর নামটা এম্ব্রয়ডারি করেছিল। বান্টিরই খাতা থেকে মাস্টারনি রাজুর নাম মুছে দিয়েছিলেন। বিয়ের কার্ডে সমাজ রাজুর নাম লিখতে দেয়নি আর আজ বান্টিই ওর মেহেন্দি লাগানো হাত দিয়ে রুমাল থেকে ওর নাম তুলে দিচ্ছে।

'যাকগে, ছাড় ওসব কথা। তুই তো নিজেই বলতি যে ওটা কেবল 'হাসি আর কথা বলা প্রেম'...'

'ভাবিনি কোনোদিন, কিন্তু ওই হাসি আর কথা বলতে ভালো লাগার প্রেমই ভেতর পর্যন্ত গেঁথে গেছে। সব আমার রক্তে মিশে আছে।' বান্টির চোখ ছলছল করে উঠল।

'শুনেছি তোর শ্বশুরবাড়ি নাকি খুব বড়লোক। অনেক পুণ্য করেছিলি নিশ্চয়ই? ওর নামও তো কর্মচন্দ...' কায়দা করে কথাটা ঘোরালাম।

'নাম থাকলেই কি আর কর্মফল পাওয়া যায়?' বান্টি শুধু এটুকুই বলল।

'মাঝে মাঝে চিঠি লিখবি তো, না রাজরানি হয়ে আমাদের সবাইকে ভুলেই যাবি?'

'ভোলাটা কি এতই সহজ রে!' বান্টি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তখনও বোধহয় বান্ধবীদের কথা নয়, শুধু রাজুর কথাই ওর মনে পড়ছিল।

'রাজুকে তুই ভুলতে পারিস চাই না পারিস, চিঠি তো আর লিখতে পারবি না! মাঝে মাঝে আমাকেই চিঠি লিখিস, ইচ্ছে হলে রাজুর কথাও লিখিস!'

'ঠিক আছে মাঝে মাঝে মনের বোঝা হালকা করে নেব, কিন্তু একটা কথা।

'কী কথা?'

'তুই কিন্তু ওকে নিয়ে আমাকে কিছু লিখিস না। এরা লোক কেমন তা তো আর জানি না! একেবারে অজ পাড়াগাঁয়েই থাকে। শুনেছি, চিঠিও ওখানে সপ্তাহে দুবারই যায়। ঠিকানায় জেলা, তহসিল, ডাকঘর, গাঁয়ের নাম, জানি না আরও কত কী লিখতে হয়। হয়তো চিঠিটা আগেই পড়ে নিয়ে তারপর আমাকে দেবে।'

বান্টি শ্বশুরবাড়ি চলে যাবার পর পনেরো বছর কেটে গেছে। প্রথম পাঁচ বছরে আমাকে কিছু চিঠি লিখেছিল। খুব বেশি নয়, তবে প্রতিটা চিঠিই ও মনের ভার

লাঘব করতেই লিখেছে। আমি প্রতিবার বান্টির চিঠির জবার দিতাম, তবে ওর অনুরোধ মতো কেবল মামুলি খোঁজখবর নেওয়া চিঠিই ওর কাছে যেত। ওর হৃদয়ঘটিত ব্যাপার নিয়ে একটা কথাও থাকত না।

তারপর বছর দশেক ওর কোনো খবর পাইনি, বান্টি আমাকে চিঠি লেখেনি। আন্দাজ করেছিলাম, ও নিজের পরিবারের মধ্যেই ডুবে গিয়েছে। আমিও ওকে কোনো চিঠি লিখিনি। যদি ওর সুপ্ত কোনো বেদনার স্মৃতি উসকে দিই।

তবে আজ হঠাৎ বান্টির চিঠি পেলাম। জানি না এটা কেমন ধরনের চিঠি! এই চিঠিটা কেবল ওর নিজের মনের কথাই নয় যেন সমগ্র নারীজাতির মনের কথা ফুটে উঠেছে।

মনটা ভারী হয়ে গেল। চিঠির জবাব দিতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলাম, কারণ লিখলে বেশ দীর্ঘ একটা চিঠি লিখে ফেলতাম, নিজের মনকেও হালকা করতে পারতাম।

ওর পুরনো সব চিঠিগুলো বের করে ফেললাম (মাঝের একটা দুটো চিঠি পেলাম না) আর আজকের চিঠিটাও সামনেই খোলা রইল। একবার সমস্ত চিঠি পড়ে ফেললাম। একজন নারীর মনের কথা...।

...!

গ্রামটা যেন কেমনতর! আজ যা করলাম, কালকেও সেই একই কাজ করব! আজ সপ্তাহের কোন বার সেটা খেয়ালই থাকে না! শুধু যখন ডাকপিয়ন চিঠি বিলি করতে আসে, বুঝতে পারি আজ মঙ্গলবার কিংবা শনিবার। সারা সপ্তাহে এখানে দুবারই মাত্র ডাকপিয়ন আসে, ঠিক যেমন শহরে তেল-তামা ভিখিরি সপ্তাহে দুবার আসে।

ডাকপিয়ন এলে মনে হয় যেন বলছে, 'আজ মঙ্গলবার, যার যত তেল আর তামা আছে দান করে দাও।' কিন্তু জানি না এরা তেল-তামা কীভাবে দান করে যারা বন্ধুদের আর ভালোবাসার লোকদের কাছ থেকে চিঠি পায়। আমি কার চিঠির অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে থাকব?

আমার চিঠির জবাবে দুটো কথা লিখিস, কেমন। চিঠিতে এসব কথা কিছু লিখিস না যেন। শুধু এটুকুই যে তুই আমার চিঠিটা পেয়েছিস। আমি এটার জন্যই ডাকপিয়নের পথ চেয়ে বসে থাকব।

তোর

বান্টি

...!

বিয়ের সময় আমার শ্বশুরমশাইকে দেখেছিলি, ওই যাঁর ধবধবে সাদা দাড়ি ছিল! আমার শাশুড়িকে দেখলে তুই অবাক হয়ে যেতিস। শাশুড়ি তো দূরের কথা, আজকাল ওঁকে কারোর পুত্রবধূ বলেও মনে হয় না, একেবারে কাজের মেয়ের

মতোই দেখায়। বয়সে আমার থেকে তিন কী চার বছরের বড়ই হবেন, কিন্তু শারীরিক দিক থেকে খুবই নরমসরম, ছিপছিপে, চঞ্চল এক হরিণীর মতো। হতে পারেন উনি আমার সৎ শাশুড়ি, কিন্তু শাশুড়িই তো। শাশুড়ি না হলে ওঁকে আমার সহেলি বানিয়ে নিতাম।

আজ ছিল মঙ্গলবার। ডাকপিয়নের আসার দিন। মনে হলো তোর চিঠি আসতে পারে। আমি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকপিয়নের অপেক্ষা করতে লাগলাম। শাশুড়িও আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন।

ডাকপিয়ন এলো। এসে আমাকে একটা চিঠি দিল। আমি শাশুড়ির মুখের দিকে তাকালাম। খুবই বিষণ্ন লাগল ওঁকে। মনে হলো, আজ নিশ্চয়ই কারোর কাছ থেকে ওঁর একটা চিঠি আসার ছিল, কিন্তু আসেনি।

'ভাবি, কোনো চিঠি আসার ছিল তোমার?' ওঁকে বিষণ্ন দেখে জানতে চাইলাম।

'আমার আবার কার কাছ থেকে চিঠি আসবে?' প্রথমে তো উনি এটাই বললেন, কিন্তু তারপর বলতে লাগলেন, 'একটা চিঠি তো আসার কথা ছিল, কিন্তু এলো না।'

'কার চিঠি?' আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম।

'ভগবানের চিঠি! আর কার কাছ থেকেই বা আমার চিঠি আসতে পারে?' মনে হচ্ছিল উনি কেঁদে ফেলবেন, কিন্তু কাঁদলেন না। কিংবা কাঁদলেন হয়তো, কিন্তু কারোর চোখে ধরা না পড়ার মতো কান্না। বুঝলি তো আমরা মেয়েরা কেমনতর কান্না কাঁদতে পারি! মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছে করে আমি জোরে জোরে কেঁদে উঠি আর উনিও জোরে জোরে কেঁদে উঠুন।

তোর

বান্টি

...!

বিশ্বাস কর, যেদিন থেকে এসেছি, এই সংসারকে কখনোই নিজের সংসার বলে মনে হয়নি। আমি যেন একজন মেহমান। তবে এবার এই সংসারে বাঁধা পড়ে গেলাম। একরত্তি একটা রাজু আমার কোলে এসে আমাকে বেঁধে ফেলেছে। বাড়ির সবাই ওকে দীপক নামে ডাকে।

সন্ধের সময় বেশ ঠাণ্ডা পড়ে যায়। আমি এই লাল রঙের রেশমি রুমালটা ওর মাথায় বেঁধে দিই। লাল রুমালে ওকে আরও মিষ্টি লাগে। ওকে কোলে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

তোর

বান্টি

...!

তিন বছর হয়ে গেল আমার রাজুর। মনের কথাটা বলি তোকে? মাঝে মাঝে যখন আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি, দেখতে দেখতে ওর মুখটা বড় হয়ে যায়। ওর শরীরটাও বেড়ে ওঠে। ঠিক যেন আমার রাজু পঁচিশ বছরের হয়ে গেছে, আর আমি কুড়ি বছরের। আমি একটা পাগলি, তাই না রে?

আমার রাজু খুব দুষ্টু। এখনই আমার সঙ্গে খেলছিল। এখন সোজা রান্নাঘরে পৌঁছে গেছে। গরম উনুনে এক গ্লাস জল ঢেলে দিয়েছে। উনুনটা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। বেচারি শাশুড়ির পুরো দিন চলে যাবে নতুন করে উনুন বানাতে।

আচ্ছা, তোকে একটা কথা বলি। আমার শাশুড়ি যে উনুন গড়েন দেখে মনে হয় ঠিক যেন একটা প্রতিমা খোদাই করছেন। এমন সুন্দর উনুন তুই কখনো দেখিসইনি। উনুন গড়ায় ওঁর খুব শখ। কিছুদিন পরে পরেই, উনুনটা ভেঙে ফেলে আবার নতুন করে গড়েন। যেদিন উনি রান্নাঘরের উনুনটা গড়েন, সেদিন বাইরের উনুনে আমি রুটি সেঁকে নিই। এমনিতে রান্নাবান্নার কাজটা, যথাসম্ভব, উনিই নিজের হাতে সামলান। পনেরো কুড়ি দিন পরে পরে রান্নাঘরের উনুনটা ভেঙে ফেলে নতুন করে গড়েন, সেদিন রান্নাবান্নার কাজে আর হাত লাগান না। উনুন গড়ার ব্যাপারে ওঁর খুব উৎসাহ। প্রতিবার জলে মাটি ভিজিয়ে নিয়ে উনি বসে যান, রান্নাঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেন। কাদামাটি মাখতে মাখতে গলা ছেড়ে গান গাইতে থাকেন।

এমনিতে আমি ওঁকে গান গাইতে শুনিনি। গানের কথা না হয় বাদই দিলাম, মন খুলে কথা বলতেও শুনিনি; কিন্তু উনুন গড়ার সময় এমনভাবে গান ধরেন মনে হয় যেন কেউ চরকা কাটার তালে তালে আনমনে গান ধরেছেন। ভগবানই জানেন কী ধরনের ভাবনা ওঁর মনে ঘোরাফেরা করে! ওঁর মা-বাবাও তো ওঁর যৌবনটা কেড়ে নিয়েছেন! হিরের টুকরো একটা মেয়েকে দাঁড়িপাল্লায় বসিয়ে রুপোর দামে বিক্রি করে দিয়েছেন।

সব শেষে দুটো কথা, জলদি চিঠি দিবি।

তোর

বান্টি

...!

আমার শাশুড়ি যে গানটা গেয়ে থাকেন তুই সেটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলি। পুরো গানটা তো উনি কখনোই গাননি। যখনই উনি গানের একটা কলি ধরেন তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেটাই গেয়ে চলেন।

আজও উনি পুরনো উনুন ভেঙে ফেলে নতুন উনুন গড়তে আরম্ভ করেছেন। রান্নাঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ওঁর গলা শোনা যাচ্ছে :

'আয় রে চন্দা, হাত সেঁকে নে।

বিরহের জ্বালা আমাকে আগুনে